মোদী রাজের তিন বছর পর
আম্বেদকর অধ্যয়ন

-- দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

বিজেপি তার 'আইকনদের হাতিয়ে নেওয়ার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ'-এর অঙ্গ হিসাবে আম্বেদকরকে হিন্দুত্বর স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। আমাদের বলা হচ্ছে যে, আম্বেদকর এমন এক শক্তিশালী জাতি গঠনের কথা বলেন যেখানে জাতপাতের কোনো বিভাজন থাকবে না, আর হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে বিজেপি ঠিক এটাই করতে চাইছে। আম্বেদকর দলিতদের ক্ষমতায়নের কথা বলেন, আর বিজেপির প্রচারকরা বলতে শুরু করেছেন যে, রামনাথ কোবিন্দের নির্বাচন এই লক্ষ্যের প্রতি বিজেপির অঙ্গীকারের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আম্বেদকর ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রধান রূপকার, আর তাই বিজেপির কাছে তিনি হলেন 'আধুনিক মনু'! আম্বেদকর শেষ যে প্রতিবাদের স্বাক্ষরটি রাখেন সেটি হল বৌধ ধর্ম গ্রহণের তার সিদ্ধান্ত, আর এটাতেও পুনরায় ধর্মান্তরনের আরএসএস-এর অভিযানে কাজে লাগানো হচ্ছে। সংঘ পরিবারের কাছে বৌধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা, এবং মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বৌধ ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারাটা 'ঘর ওয়াপসির' রণনীতিবিদদের কাছে প্ল্যান বি বা দ্বিতীয় বিকল্প।

এ সত্ত্বেও আম্বেদকরই কিন্তু সংঘ-বিজেপির নকশার এক শক্তিশালী সমালোচনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপিত করেন, এবং বর্তমানে আমরা যে 'বিপর্যয়'-এর মধ্যে দিয়ে চলেছি তিনি তার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ভারতের জাতপ্রথা সম্পর্কে তার নিবিড় পর্যালোচনা এবং সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে, অন্তর্নিহিত যে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনগুলি স্বাধীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটিকে লক্ষ্মণ রেখায় গণ্ডিবদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে তার সুগভীর ভাষ্যকে বিগত বছরগুলিতে প্রণালিবদ্ধভাবে পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এবং তাকে পর্যবসিত করা হয়েছে অন্যান্যদের মতো আর একটি দলিত আইকনে, অথবা এক পণ্ডিত আইনজীবীর পরিচিতিতে যিনি সংবিধান রচনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এইভাবে আম্বেদকরকে তার মতাদর্শ থেকে বিযুক্ত করাটা, তার বিপ্লবী বীক্ষাকে ছেঁটে দিয়ে পরিচিতির রাজনীতির এক আইকন রূপে তাকে লঘু করে তোলাটা বা তার এই নব নির্মাণ তাকে আত্মসাতের সংঘীয় দূরভিসন্ধিকে সহজসাধ্য করে তুলেছে। বর্তমান জমানার একনায়কতান্ত্রিক অভিসন্ধিকে উন্মোচিত করা ও তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি জাতপ্রথা, জাতি, সংবিধান ও গণতন্ত্র সম্পর্কে আম্বেদকরের বিপ্লবী বলিষ্ঠতা ও বীক্ষাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ও ছড়িয়ে দেওয়াটা গণতন্ত্রের সমস্ত রক্ষকের কাছে অবশ্য কর্তব্য রূপে দেখা দিয়েছে।

ভারতের শাসকশ্রেণীগুলির পছন্দের প্রধান দল হিসাবে বিজেপির উত্থান এবং অভূতপূর্ব মাত্রায় হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের সর্বাত্মক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গোটা সমাজে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তীব্র বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। মুসলিমদের পাশাপাশি দলিতরাও হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখে পড়ছেন। চূড়ান্ত পরিহাসের ব্যাপার হল, বিজেপি দলিতদের নিজের দিকে টেনে নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের লড়িয়ে দিতে চেষ্টার কোনো কসুর করছে না। একদিকে দলিত-বিরোধী নিপীড়ন এবং অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদের আক্রমণাত্মক এজেন্ডায় তাদের যুক্ত করার প্রয়াস — এই দুয়ের সংযুক্তি ভারতে দলিত রাজনীতির কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জময় পরিস্থিতি রূপে দেখা দিয়েছে।

উপনিবেশ পরবর্তী ভারতবর্ষে মূল ধারার দলিত রাজনীতি তাদের অগ্রগতির জন্য সরক্ষণের উপর নির্ভর করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং তারা আজকের এই সন্ধিক্ষণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকে দলিতদের এক ছোট অংশই লাভবান হয়েছিল আর ওবিসিদের এক বৃহত্তর অংশ জমিদারী প্রথা বিলোপ এবং সবুজ বিপ্লবের পর কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি থেকে লাভবান হয়েছিল। স্বাধীনতার প্রথম কয়েক দশক পর জাত এবং শ্রেণী উভয় দিক থেকেই শক্তির ভারসাম্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিল, যখন আগেকার দিনের প্রধানত উচ্চবর্ণের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের পাশাপাশি মধ্যবর্তী জাতগুলি থেকে ধনী কৃষক বা কুলাক শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল এবং আরও উত্থান ঘটেছিল ব্যবসাদার এবং পুঁজিপতিদের যারা দেশীয় পুঁজির পূর্বেকার সীমিত ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অবশেষে যখন বলবৎ হল, ইতিমধ্যেই ভারতের এক বড় অংশে প্রাধান্যকারী সামাজিক শক্তি হিসাবে ওবিসি ক্ষমতা গোষ্ঠীগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে গিয়েছিল। মণ্ডল কমিশনের উদ্ভব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে সংহত করে তুলতে সাহায্য করেছিল মাত্র, বিশেষভাবে প্রাদেশিক শাসন এবং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে।

গোড়ার দিকে উচ্চবর্ণের প্রত্যাঘাতের বিরুদ্ধে -- যে প্রত্যাঘাতে যথেষ্ট মাত্রায় প্ররোচনা যুগিয়েছিল ও নেতৃত্ব দিয়েছিল সংঘ বাহিনী -- দলিতরা ওবিসিদের এই নতুন ক্ষমতায় সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু দ্রুতই দেখা গেল, তাদের আকাঙ্খা ও অধিকার অর্জন করতে গিয়ে দলিতদের বাস্তবের জমিতে আগ্রাসী ওবিসি ক্ষমতার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীকে সমাজবাদী পার্টির মুলায়ম সিং যাদবের সঙ্গ ছাড়তে হল; বিহারে রামবিলাস পাশোয়ানকে লালু প্রসাদের প্রাধান্যের বাইরে নিজের পরিসর সন্ধানের প্রচেষ্টা চালাতে হল। ওবিসি ক্ষমতার আধিপত্যের মোকাবিলার প্রক্রিয়ায় মূলধারার অধিকাংশ দলিত নেতা বিজেপির দিকে ঝুঁকলেন, আর বিজেপি তখন মণ্ডলের মুখোশের আড়ালে তার ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শকে গোপন করে 'জোট ধর্ম' অনুশীলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের দিকে মিত্রদের টেনে আনায় প্রয়াসী হল। আমরা দেখলাম, গুজরাট গণহত্যার পর মায়াবতী গুজরাটে গিয়ে মোদীর পক্ষে প্রচার চালালেন এবং উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করলেন, এছাড়া অনেক দলিত নেতা বিজেপিতে যোগ না দিলেও এনডিএ-তে যোগ দিলেন। এই ধারা ২০১৪-র নির্বাচনের সময় ও তার পরেও অব্যাহত রইল, যখন উদিত রাজ বিজেপিতে যোগ দিলেন, রামবিলাস পাশোয়ান পুনরায় এনডিএ-তে ঢুকলেন এবং অস্থায়ী পরিবর্ত মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মানঝি নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলালেন।

বিএসপি যথাযথভাবেই এই শ্লোগান দিয়েছিল যে 'ভোট হামারা, রাজ তুমহারা -- নহি চলেগা, নহি চলেগা' (ভোট আমাদের আর শাসন করবে তুমি, এটা চলতে দেওয়া যাবে না), কিন্তু 'রাজ' পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জে সে একটা অতি সরল উত্তরই দিল : 'ভোট সে লেঙ্গে পিএম, সিএম —আরক্ষণ সে এসপি, ডিএম' (নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী পাব, আর সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের পদ অধিকার করব)। অর্থনৈতিক শোষণ, ক্ষমতা কাঠামোয় অন্তর্নিহিত উৎপাদন ও সম্পদ সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করা হল না। ভূমিসংস্কারের এজেন্ডাকে পরিত্যাগ করা এবং তার ফলশ্রুতিতে বিকাশরুদ্ধতা এবং গ্রামীণ ভারতের ব্যাপক সংখ্যাধিক দলিতের, যারা প্রধানত ভূমিহীন মজদুর, অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির মতো বিষয়গুলির বিএসপি-র আলোচনাধারায় কোনো ঠাঁই হল না। এসত্ত্বেও নির্বাচনী ক্ষেত্রে বিএসপি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল এবং মায়াবতী নয় নয় করে চারবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন এবং মূলধারার দলিত রাজনীতির কাছে এটাই যথেষ্ট বলে মনে হল।

আজ নির্বাচনী ক্ষেত্রে বিএসপি-র ব্যর্থতা এবং দলিতদের উপর নিপীড়নের তীব্রতা বৃদ্ধি দলিতদের মধ্যে বিকল্পের সন্ধান এবং নতুন করে আম্বেদকর অধ্যয়নের আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলেছে। রোহিত ভেমুলার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার ঘটনায় সাধারণভাবে ছাত্রসমাজ এবং বিশেষভাবে বাম ছাত্র আন্দোলন যে আন্তরিকতার সাথে সাড়া দেয় তা এই প্রক্রিয়াকে উজ্জীবিত করে তোলে। হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেএনইউ-র ছাত্ররা 'রোহিতের জন্য ন্যায়বিচার' প্রচারাভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং দেশদ্রোহের অভিযোগ এনে ও পুলিশী নিপীড়ন নামিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করার মোদী প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস তাদের পক্ষে আত্মঘাতী হয়েই দেখা দেয়। এর পরের মোড়টা ছিল উনা -- দাদরি থেকে লাতেহার পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে গরু নিয়ে সংঘ চালিত হিংসার অনেক ঘটনাই ঘটেছিল, কিন্তু উনার ঘটনা শক্তিশালী প্রতিবাদের জন্ম দিল এবং মুসলিমরাও অবিলম্বে তাতে যোগ দিলেন। দলিত-মুসলিম ঐক্যের কাঙ্খিত এই সম্ভাবনার সাথে সাথে উনা দলিত ও বামেদের মধ্যে সহযোগিতার উৎসাহজনক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সম্ভাবনাকেও সামনে নিয়ে এল। সাহারনপুরের নৃশংসতার ঘটনা ভিম সেনাকে সামনে নিয়ে আসে, এবং সংঘের সহিংস চক্রান্তের বিরুদ্ধে জঙ্গী প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকতর স্তরেই অনুভূত হচ্ছে।

উনা প্রতিরোধ জাত-ভিত্তিক কাজের 'সংরক্ষণ' ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা হাতে করে মল সাফাই থেকে মৃত পশুর শব সৎকারের মতো মর্যাদাহানিকর কাজগুলি দলিতদের করতে বাধ্য করে। তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প পথের চাবিকাঠি হিসাবে জমির পুনর্বণ্টনের উপর জোর দিয়েছে। এটা করার মধ্যে দিয়ে ঐ প্রতিরোধ আম্বেদকরের বিপ্লবী অর্থনৈতিক বীক্ষাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে যেটা আম্বেদকর তার ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি পর্যায়ে সুস্পষ্টরূপে বিধৃত করেন। সেই সময় আম্বেদকর বলেন, নিপীড়িতদের জীবনে প্রকৃত গণতন্ত্র আনতে গেলে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পুঁজিবাদ এই দুই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। এইভাবে দলিত আন্দোলনে বামমুখী একটা পরিবর্তন দেখা গেল এবং তার সাথে কমিউনিস্টদের শ্রেণী রাজনীতির চর্চায় দলিত আত্মঘোষণার বিপ্লবী সম্ভাবনা এবং তাৎপর্যও আন্তরিক স্বীকৃতি পেল। এর ভিত্তিতেই দলিত আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন কাছাকাছি আসতে পারে, পারস্পরিক সহযোগিতা চালাতে পারে এবং দলিত মুক্তি এবং সামাজিক রূপান্তরণের লক্ষ্যে পরস্পর মিলিতও হতে পারে।

জাতপ্রথা অর্থাৎ 'বহু-স্তরীয় অসাম্য' এবং জাতপ্রথার নির্মূলীকরণে আম্বেদকরের বিপ্লবী বীক্ষা ও রণনীতি

দলিত মুক্তির শর্ত যে জাতপ্রথার নির্মূলীকরণের মধ্যেই রয়েছে সে বিষয়ে আম্বেদকর সংশয়হীন ছিলেন — কোনোভাবে যুক্তিযুক্ত করা অথবা লঘু করে তোলার ওকালতির বিপরীতে বিলকুল নির্মূলীকরণ। এই আমূলপন্থী অবস্থানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে গিয়ে আম্বেদকরকে এমনকি গান্ধীর সঙ্গেও বিতর্ক চালাতে হয়েছে, যিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা এবং সমাবেশ কেন্দ্র। জাতপ্রথাকে শ্রমের বিভাজন অথবা 'বর্ণাশ্রম' রূপে গণ্য করার গান্ধীর ধারণাকে আম্বেদকর প্রত্যাখ্যান করেন এবং এটাকে তিনি স্তরভিত্তিক অসাম্য রূপে ব্যাখ্যা করেন। শ্রমের বিভাজন বলতে যা বোঝায় সেই ধারণাটা কিন্তু সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে বৈপরীত্যমূলক নয়, কিন্তু জাতের বিভাজন সামাজিক গতিশীলতাকে নাকচ করে এবং জাতপ্রথা চায় সমাজ তাকে ঈশ্বর নির্দেশিত ব্যবস্থা বলে মেনে নিক। ঈশ্বর নির্দেশিত অনমনীয় স্তরভিত্তিক সামাজিক বিভাজনের ধারণাটাই জাতপ্রথাকে সম্পর্ণরূপে পশ্চাদমুখীন করে তোলে এবং একে সংস্কারের কোনো মোহ আম্বেদকর পোষণ করতেন না।

জাতপ্রথার নির্মূলীকরণের আহ্বান ভারতের অন্য যে কোনো সমাজ সংস্কারক অথবা সমাজ ভাষ্যকারের থেকে আম্বেদকরকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। জীবনের শেষ বছরগুলিতে আম্বেদকর যতই মার্কসের থেকে দূরে সরে যান না কেন, দলিত মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে জাতপ্রথা বিলোপের ধারণাটা তাকে মার্কসেরই সহচর করে তোলে যিনি সর্বহারার মুক্তির জন্য একই ধরনের দিশা দিয়েছিলেন। মার্কসীয় ভাবনায় সর্বহারা যেমন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে তার চূড়ান্ত মুক্তির কথা ভাবতে পারে না, তেমনি আম্বেদকরের চিন্তাধারায় দলিতরাও জাত বিভক্ত সমাজকে মেনে নিতে পারে না। নিজেদের মুক্তির জন্য দলিতদের জাতপ্রথাকে ঝাড়েমূলে বিদায় করতে হবে।

সমাজের সমগ্র স্তরের উপর আরোপিত ঈশ্বরীয় বিধান থেকেই জাতপ্রথা যেহেতু তার বৈধতা অর্জন করেছে, সে কারণে আম্বেদকর এই তথাকথিত ঈশ্বরীয় অভিসন্ধিকে পুরোদমে প্রত্যাখ্যানের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। সাম্রাজ্যবাদ তথা মনুবাদী মতবাদের প্রতি এই আমূল বিরোধিতাই আম্বেদকরের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের এক নির্ণায়ক নীতি হয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ যে বিদ্যমান সম্পদ সম্পর্কে ও ক্ষমতা কাঠামোকে বৈধ করে এবং তার দ্বারা আবার মদতপুষ্ট হয়, তা নিয়ে আম্বেদকরের কোনো সংশয় ছিল না। আর তাই জাতপ্রথাকে ধ্বংস করতে হলে আমাদের শুধু তাকে প্রত্যাখ্যান করলেই হবে না, বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকেও অপসারিত করতে হবে। ১৯৩০-এর দশকে আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পুঁজিবাদকেই নতুন পার্টির নিশানা হিসাবে চিহ্নিত

করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং জমির জাতীয়করণ আম্বেদকরের অর্থনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। এবং ভারত অবশেষে যে সংবিধানটি গ্রহণ করে সেটি এতদূর যেতে না পারলেও, সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে চরম অসম ভূমি-সম্পর্ক এবং সম্পদ ও আয়ের বণ্টনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্বকে আম্বেদকর কখনই খাটো করেননি।

জাতব্যবস্থা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে বিতর্কে আম্বেদকর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেন। গান্ধীর বর্ণাশ্রম বা শ্রম বিভাজনের তত্ত্বকে নাকচ করে তিনি বলেন, ''... জাতব্যবস্থা শুধু শ্রমের বিভাজনই নয়। এটা শ্রমিকদের মধ্যেও বিভাজন। সভ্য সমাজে অবশ্যই শ্রম বিভাজনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কোনো সভ্য সমাজেই শ্রম বিভাজনের সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে এমন অস্বাভাবিক অভেদ্য বিভাজনের সহাবস্থান নেই। জাতব্যবস্থা শুধু শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনই নয়, যেটা শ্রম বিভাজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা -- এটা এমনই একটা স্তরবিন্যাস যার মধ্যে শ্রমিকদের বিভাজনে একে অপেরর থেকে উচ্চস্তরে বিন্যস্ত হয়।'' (বি আর আম্বেদকর, জাতপ্রথার নির্মূলীকরণ)। আম্বেদকর বলেন, জাতপাতের মোকাবিলার চাবিকাঠি অতএব হল জাত ভেদাভেদ নির্বেশেষ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

এটা আমাদের জাত-শ্রেণীর আন্তসম্পর্কের উপলব্ধিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সন্ধান দেয় : শ্রেণীকে জাতপ্রথার মধ্যে দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া উৎপীড়ন ও বৈষম্যের বাস্তবতাকে স্বীকার করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই রূপের সামাজিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে শ্রেণীকে উপলব্ধি করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলে তা সমাবেশ ও গতিশীলতার এমন সচেতন সামাজিক একক হয়ে ওঠে যা জাতপাতের স্তরবিন্যাস ও বংশপরম্পরার নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে জাতের কঠোর অনুশাসন ও অনড়তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পরাস্ত করতে পারে। শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী লোকজন এবং এমনকি তার কিছু কুশীলবও শ্রেণীসংগ্রামকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করতে চান, এবং এইভাবে তারা শ্রেণীসংগ্রামের জাতভিত্তিক উৎপীড়ন ও অন্যায়ের বাস্তবতার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে থাকার ছকবাঁধা আদলটাকেই আরও শক্তিশালী করে তোলেন।

আম্বেদকর বরাবরই জাতপ্রথার সবর্ণ বিবাহের কাঠামোর দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন। আম্বেদকর মাঝেমধ্যে সবাইকে নিয়ে একত্রে ভোজন বা উপাসনা স্থলে সকলের প্রবেশের মত সার্বজনিক অনুষ্ঠান সংগঠিত করলেও তিনি অসবর্ণে বিবাহের মতো জাতপাতের গণ্ডির নেতিকরণের আরও কার্যকরী পন্থার উপরই গুরুত্ব দেন। জাতপাতের এই ধরনের লঙ্ঘন তখনই নিয়ম হয়ে উঠতে পারে যখন সামাজিক গতিশীলতা আরও বেশি থাকবে, বিশেষভাবে থাকবে প্রেম ও বিবাহের বিষয়গুলি সহ নিজেদের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নারীদের স্বাধীনতা। অন্যভাবে বললে, জাতপ্রথার কঠোর অনুশাসন ও পিতৃতন্ত্র যেমন পরস্পরকে শক্তিশালী করে, সেরকমভাবে একটি দুর্বল হয়ে পড়লে তা অন্যটিকেও দুর্বল করবে। জাতপ্রথার নির্মূলীকরণের লড়াইয়ে লিঙ্গ ন্যায়ের সংগ্রামকে তাই একটা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম হিসাবেই গণ্য করতে হবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস, এবং লিঙ্গ ন্যায় ও পুরুষ আধিপত্য থেকে নারীর স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম — এগুলি সবই জাতপ্রথার নির্মূলীকরণ সম্পর্কে আম্বেদকরের বীক্ষা ও রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সামাজিক ন্যায়ের মূল ধারার রাজনীতি বস্তুত বিকশিত ও আবর্তিত হয়েছে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ এবং সামাজিক সমীকরণকে জাতভিত্তিতে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা অথবা জোড়াতালির নির্বাচনী সমীকরণ গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে। এবং জাতপ্রথাকে ধ্বংস করার মতাদর্শগত প্রেরণাকে কার্যত নির্বাসিত করা হয়েছে একেবারে পিছনের সারিতে।

এর মধ্যে দিয়ে এমন এক ধরনের পরিচিতির রাজনীতির উত্থান ঘটেছে যা ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের আধিপত্যের সঙ্গে ভালোভাবেই সহাবস্থান করতে পারে। আমরা দেখেছি বিহারে জেডিইউ-এর সহযোগিতায় বিজেপি সামাজিক সমীকরণকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসার কৌশল রপ্ত করে এবং তারপর সেটিকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করে বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষভাবে উত্তরপ্রদেশে। আর আমরা এখন সেখানে এই প্রহসনকে মঞ্চস্থ হতে দেখছি যে, অত্যন্ত আগ্রাসী রূপের কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী অথবা মনুবাদী মতাদর্শের ভয়াবহ পুনরুত্থানের সংমিশ্রণে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক ওবিসি প্রধানমন্ত্রী, যিনি এখন থেকে এক দলিত রাষ্ট্রপতির আইনি মদত পাবেন।

সংবিধান এবং আম্বেদকরের ভবিষ্যৎদর্শী রচনাসমূহ

ব্যাপকতর স্তরেই আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানের জনক রূপে স্বীকৃত হন। তিনি পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির সাংবিধানিক সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং ভারতে সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের অতীত দৃষ্টান্তগুলি, বিশেষভাবে বৌদ্ধ সংঘগুলির পরিচালনা নিয়ে গভীর চর্চা করেন। এবং এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতের গণতন্ত্রের এক নীল নকশার জন্ম দেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে দ্বন্দ্বগুলি সংবিধানের চারদিকে লক্ষ্মণ রেখা টেনে দিয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে তিনি আমাদের এক সুস্পষ্ট ধারণা দেন। যেদিন সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়, গণতন্ত্রের জয়গান গেয়ে সেই ঐতিহাসিক ক্ষণকে তিনি উদযাপন করেননি; এর বিপরীতে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তিনি আমাদের সেই দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন যেগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক ভিত্তিকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর সাংবিধানিক সভায় তার শেষ ভাষণের শুরুতে আম্বেদকর সংবিধান রচনা কমিটি ও সংবিধানের বিরুদ্ধে চালিত বিভিন্ন সমালোচনার জবাব দেন; কিন্তু ভাষণ শেষ করেন ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, গণতন্ত্র তার বাহ্যিক রূপ বজায় রেখেও বাস্তবে একনায়কতন্ত্রে পরিণত হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সোচ্চারে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সতর্ক করেন। তার ঐ ভাষণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ

সতর্কীকরণ ছিল — (ক) রাষ্ট্র এবং জনগণ সংবিধান মেনে কাজ করবে নাকি নৈরাজ্য দাপিয়ে বেড়াবে, (খ) ভারতবর্ষ কি বীরবন্দনার হুজুগকে প্রতিহত করতে পারবে যা গণতন্ত্রের অধঃপতন এবং একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবের অব্যর্থ পন্থা, এবং (গ) স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব — সংবিধানের বনিয়াদ এই ত্রয়ীকে কি কার্যক্ষেত্রে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে, নাকি ক্রমবর্ধমান অসাম্য এবং তার পরিণাম স্বরূপ স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের বঞ্চনা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সৌধটিকে ধূলিসাৎ করবে। এই তিনটি সতর্কীকরণ আজ অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে সামনে এসেছে।

এমন একটা সরকার এখন রয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকে এড়িয়ে যাওয়াটাকেই যে অভ্যাসে পরিণত করেছে (এই বিষয়ে একটা মাত্র উদাহরণই বিচার করা যাক, সংসদ আধার কার্ড নিয়ে আপত্তি জানালেও এবং একে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের সুস্পষ্ট রায় থাকলেও একে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে), এখন আমরা এমন একটা পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করছি যেখানে অপরাধের বহু অভিযোগে অভিযুক্ত একজনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানো হয়েছে এবং তিনিই ঠিক করছেন যে দেশের আইন তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে কিনা, এবং এখন খুনে জনতা রাস্তায় এবং এমনকি ট্রেনের মধ্যেও হত্যা সংঘটিত করার ক্ষমতা পেয়ে গেছে।

আম্বেদকরের প্রত্যাশা ছিল যে, আন্দোলনে বা দ্বন্দ্বের মীমাংসায় অসাংবিধানিক পন্থার (এই প্রসঙ্গে তিনি আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহের মতো গান্ধীর সুপরিচিত প্রকরণগুলিরও উল্লেখ করেন) কোনো প্রয়োজন হবে না, কারণ, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অভীষ্ট অর্জনে সাংবিধানিক পন্থা গ্রহণের সুযোগ সব দলেরই থাকবে। কিন্তু কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো ইতিহাসগত দিক থেকে অমীমাংসিত সমস্যাগুলি হোক, অথবা কৃষিসংকট এবং মেহনতি জনতার মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার ইস্যুগুলির মোকাবিলা অথবা জাতপাত ভিত্তিক এবং লিঙ্গ নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক হিংসার শিকার মানুষজনের ন্যায়বিচারের ইস্যুই হোক, সমস্ত ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র প্রণালীবদ্ধভাবে সাংবিধানিক পথকে পরিহার করে বিচার-বহির্ভূত দমনেরই আশ্রয় নিয়েছে।

দ্বিতীয় সতর্কীকরণটা উদ্ভূত হয়েছে গণতন্ত্র বজায় রাখায় আগ্রহী সমস্ত মানুষের কাছে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর সাবধানবাণী থেকে, যা হল, 'এমনকি কোনো মহান ব্যক্তির কাছেও নিজেদের স্বাধীনতাকে সমর্পণ না করা, অথবা তার উপর এমন ক্ষমতা ন্যস্ত না করা যার বলে সে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করতে পারে।' আম্বেদকর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই সাবধান বাণী ''অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে ভারতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, কেননা, ভারতে ভক্তি বা যাকে বলা যায় উপাসনা বা বীর-বন্দনার পথ রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার মাত্রা এমনই যে এর সঙ্গে বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের রাজনীতিতে পালন করা তার ভূমিকার কোনো তুলনাই চলে না।''

আম্বেদকর অত্যন্ত সঠিকভাবেই আমাদের সতর্ক করেছেন যে, ''ধর্মে ভক্তি আত্মার মুক্তির পথ হতে পারে'', কিন্তু রাজনীতিতে ''ভক্তি বা বীর-বন্দনা অধঃপতন এবং তার পরিণামে একনায়কত্বে পরিণত হওয়ার অব্যর্থ রাস্তা।'' আমরা দেখেছি বীর-বন্দনার এই ঝোঁকই ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি জরুরি অবস্থার বিপর্যয়ের জন্ম দেয় যখন এক স্তাবক কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতের সমতুল্য রূপে আখ্যায়িত করেন এবং আজ নরেন্দ্র মোদীকে কেন্দ্র করে এই উন্মাদনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। মোদী নিয়ে বীর-বন্দনার ফল শুধু মতাদর্শগত প্রতিপক্ষ বা রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষের দিকেই চালিত হচ্ছে না, সরকারী ছকের সঙ্গে সামান্য মতদ্বৈধতা প্রকাশ করা যে কোনো বিজেপি নেতার বিরুদ্ধেও (তা আদবানি ও রাজনাথ সিং যেই হোন না কেন) চালিত হচ্ছে।

তৃতীয় বিষয়টা হল — আম্বেদকর গুরুত্বের সঙ্গে বলেন, 'শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই হবে না', রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে 'এক সামাজিক গণতন্ত্রও করতে হবে ... যা স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বকে জীবনের নীতিমালা বলে স্বীকার করবে।' আম্বেদকর আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ''স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের এই নীতিমালা এই অর্থে ত্রয়ীর এক একক যে একটির থেকে অন্য একটিকে আলাদা করার অর্থ হবে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যটাকেই ব্যর্থ করা।'' আম্বেদকর অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপেই বিষয়টিকে তোলেন, ''ভারতীয় সমাজে দুটি জিনিসের ঘাটতি রয়েছে সে কথা স্বীকার করে শুরু করা যাক। এর একটা হল সাম্য। সামাজিক স্তরে, ভারতে এমন একটা সমাজ রয়েছে যা স্তরভিত্তিক অসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে যার অর্থ হল কেউ উপরে উঠবে আর অন্যরা নীচে নামবে। অর্থনৈতিক স্তরে এমন একটা সমাজ আমরা দেখি যেখানে কারুর সম্পদের প্রাচুর্য এবং তার বিপরীতে প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করেন।'' এর নীট ফল হল আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সাম্য এবং ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের মধ্যে বুনিয়াদি দ্বন্দ্ব।

অসাম্যকে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের প্রতি সম্ভাব্য এক বড় ধরনের বিপদ রূপে চিহ্নিত করতে গিয়ে আম্বেদকর কথার কোনো রাখঢাক করেননি : ''আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কতদিন আর আমরা সাম্যের বঞ্চনা করে চলব? এই বঞ্চনা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে তবে আমাদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তোলার বিনিময়েই আমরা তা করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে হবে, নচেৎ অসাম্যের শিকার জনগণ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের এই কাঠামোকেই ধূলিসাৎ করবে যাকে এই সভা কঠোর পরিশ্রম সহকারে গড়ে তুলেছে।'' আম্বেদকর যখন এই বিষয়ে লিখছিলেন সেই সময় যে অর্থনৈতিক অসাম্য গভীরে শিকড় চাড়িয়েছিল, তা নয়া-উদারবাদী নীতিমালার জমানায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। ২০১৪ থেকে ২০১৬-র মধ্যে সবচেয়ে উপরে থাকা এক শতাংশের সম্পদ লাফিয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে মোট জাতীয় সম্পদের প্রায় ৬০ শতাংশ হয়েছে। এই অসাম্য ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠায় সমস্ত ধরনের বৈষম্যও ভয়াবহ মাত্রা অর্জন করেছে -- যেগুলি হল, গ্রাম বনাম মহানগর, কৃষিসংকট বনাম কর্পোরেট লুট ও বৈভব এবং উন্নত এলাকা বনাম পশ্চাদপদ অঞ্চল। এই বিপুল অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে যদি জাতপাতগত নিপীড়ন এবং সাম্প্রদায়িক

মেরুকরণের নতুন রূপে তীব্রতা বৃদ্ধির বিষয়টা যোগ করা হয় তবে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের এই ত্রয়ী সম্পূর্ণ অলীক বস্তু রূপেই দেখা দেয়।

জাতি, জাতপ্রথা ও 'হিন্দু রাজ'

জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সৌভ্রাতৃত্ব যে ভারতে নেই সে সম্পর্কেও আম্বেদকরের কোনো সংশয় ছিল না : ''আমি এই মতামত পোষণ করি যে, আমরা যদি নিজেদের এক জাতি রূপে বিশ্বাস করি তবে আমরা এক বড় ধরনের মিথ্যা মোহ লালন করছি। হাজার হাজার জাতে বিভক্ত জনগণ কীভাবে জাতি হতে পারে? জাতি শব্দটির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অর্থে আমরা যে এখন জাতি হয়ে উঠিনি সে কথাটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব ততই মঙ্গল। কেবল মাত্র তখনই আমরা জাতি হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব এবং এই লক্ষ্য অর্জনে পন্থা-পদ্ধতির কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবব।'' আম্বেদকরের মতে জাতপাতে জর্জরিত সমাজে প্রকৃত জাতিয়ত্ব আসতে পারে না। দ্বিধাহীনভাবে তিনি ঘোষণা করছেন যে জাত ব্যবস্থা জাতি-বিরোধী : '' প্রথমত এই কারণে যে তারা সামাজিক জীবনে বিভাজন নিয়ে আসে। তারা এই কারণেও জাতি-বিরোধী যে তারা জাতগুলির মধ্যেই ঈর্ষা ও বিরূপতার জন্ম দেয়।'' এটা হিন্দু ধর্মের ধারণাটাকেই নস্যাৎ করে। আম্বেদকর বলেছেন, মহা হিন্দু ঐক্যের পরিচিতি শুধু হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ই প্রাসঙ্গিক হয়, অন্যথায় যা জাতসমূহের এক পুঞ্জিভবন মাত্র তার মধ্যে সংহতির বা সম্প্রদায়ের কোনো বোধ থাকতে পারে না।

জাতীয়তাবাদ এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কেও আম্বেদকর বিশদে আলোচনা করেছেন — যা হল সংখ্যালঘুদের অধিকার। মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু, ইত্যাদি বিষয়ে সংবিধান সভার উপদেষ্টা কমিটি দ্বারা গঠিত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সাব-কমিটির কাছে ১৯৪৭ সালের ২৫ মার্চ তারিখের দাখিল করা এক স্মারকলিপিতে আম্বেদকর সংখ্যাগুরুবাদের উপর তীক্ষ্ণ আক্রমণ হানেন : ''ভারতে সংখ্যালঘুদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক নতুন মতবাদের বিকাশ ঘটিয়েছে যেটাকে সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের শাসন করার সংখ্যাগুরুর স্বর্গীয় অধিকার বলা যায়। শাসন ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সংখ্যালঘুর যে কোনো দাবিকেই সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়, আর সমগ্র ক্ষমতার উপর সংখ্যাগুরুর একচেটিয়া অধিকারকে বলা হয় জাতীয়তাবাদ।''

ভারত নামক বৈচিত্রময় দেশটা বহু সংখ্যক ধর্মীয়, ভাষাভাষি এবং জাতীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে গঠিত হওয়ার ফলে এখানে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য রেখা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং বিজেপির হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের নকশাটা যথার্থ রূপে জাতি গঠনের প্রচেষ্টার কাছে এক অমোঘ ধাক্কা হয়ে উঠতে পারে।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আম্বেদকর তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বিপদটির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন : ''হিন্দু রাজ যদি বাস্তবে গড়ে ওঠে তবে তা এ দেশের কাছে যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হয়ে উঠবে তা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। হিন্দুরা যাই বলুক না কেন, হিন্দুত্ব স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্বের কাছে এক বিপদ। গণতন্ত্রের সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ নয়। যে কোনো মূল্যেই হিন্দুরাজকে প্রতিহত করতে হবে।''

আজ প্রত্যক্ষ এক সাংবিধানিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতকে একেবারে হিন্দু রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা না হলেও মোদী সরকার ভারতকে ঐ লক্ষ্যে চালিত করার জন্য চেষ্টার কোনো কসুর করছে না। আইন রচনার প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব থেকে মুসলিমদের প্রণালীবদ্ধভাবে দূরে রাখা হচ্ছে। এই রাজনৈতিক অদৃশ্যতার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে সার্বিক নিরাপত্তাহীনতা। মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সমবেতভাবে পরিকল্পিত আক্রমণ ক্রমবর্ধমান। এই আগ্রাসী সংখ্যাগুরুবাদী শাসন যতটা মুসলিম বিরোধী, ততটাই দলিত ও দরিদ্র বিরোধী।

আম্বেদকরের সময় পেরিয়ে আজ ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্র যেহেতু অন্ধকারতম পর্যায়ে নিমজ্জিত, প্রতিটি ফ্রন্টে হানা ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য এক শক্তিশালী লড়াকু জোট গড়ে তোলাটা অত্যন্ত জরুরি। এটা শুধু নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার বিষয়ই নয়, এটা হল আম্বেদকরের স্বপ্ন অনুসারে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ভারতকে নতুন করে গড়ে তোলার বিষয়। অন্তর্নিহিত যে দ্বন্দ্বগুলি আম্বেদকর অভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলির তীব্রতা বৃদ্ধিই আজ রাষ্ট্রকে এই সংকটে নিমজ্জিত করেছে। এই সংকটকে তীব্রতর করে তুলে এবং তাকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়ে সংঘ-বিজেপির ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি তাদের কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকে চাপিয়ে দিতে চাইছে। এই ফ্যাসিস্ট চ্যালেঞ্জকে পরাস্ত করার অর্থ হল এই সংকটের এক প্রগতিশীল ও চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক সমাধান। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারতের নতুন রূপের কল্পনা ও তার নব-নির্মাণের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আম্বেদকরের বিপ্লবী বীক্ষা স্বচ্ছতা ও শক্তির অমূল্য উৎস হয়ে দেখা দিচ্ছে।